শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও দিব্যজীবন

(প্রথম খণ্ড)

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

	পৃষ্ঠা
সূচনা	১-১৬
প্রথম অধ্যায় : অর্জুনবিষাদযোগ	১৭-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংখ্যযোগ	২৮-৪২
তৃতীয় অধ্যায় : কর্মযোগ	৪৩-৪৯
চতুর্থ অধ্যায় : জ্ঞানযোগ	৫০-৫৯
পঞ্চম অধ্যায় : সন্ন্যাসযোগ	৬০-৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায় : ধ্যানযোগ	৬৬-৭৭
সপ্তম অধ্যায় : জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ	৭৮-৮৬
অষ্টম অধ্যায় : অক্ষরব্রহ্মযোগ	৮৭-৯৩
নবম অধ্যায় : রাজযোগ	৯৪-১০১
দশম অধ্যায় : বিভূতিযোগ	১০২-১১১
একাদশ অধ্যায় : বিশ্বরূপদর্শনযোগ	১১২-১২৩
দ্বাদশ অধ্যায় : ভক্তিযোগ	১২৪-১৩০
ত্রয়োদশ অধ্যায় : ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ	১৩১-১৩৭
চতুর্দশ অধ্যায় : গুণত্রয়বিভাগযোগ	১৩৮-১৪৪
পঞ্চদশ অধ্যায় : পুরুষোত্তমযোগ	১৪৫-১৫০
ষোড়শ অধ্যায় : দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ	১৫১-১৫৭
সপ্তদশ অধ্যায় : শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ	১৫৮-১৬৩
অষ্টাদশ অধ্যায় : মোক্ষযোগ	১৬৪-১৭৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দিব্যজীবন	১৭৬-১৯১

"তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা!
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?"

—রবীন্দ্রনাথ

তেরশ একুশ সালের ৩রা কার্তিক রাত্রিবেলা এলাহাবাদে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মরমি রবীন্দ্রনাথের মন প্রশ্নমুখর। তারপর তাঁর মন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে বিলাপে, বিস্তারে। স্মৃতির সমুদ্র মন্থনে। স্মৃতির গহন গর্ভগৃহ থেকে উঠে আসছে নানা পারিজাত। নানা সৌরভসম্ভার। স্মৃতির আত্মখননে উঠে আসছে হীরে-মণি- মুক্তা-জহরত। জীবনের নানা নিত্য প্রসাধন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পড়তে পড়তে মন মাঝে মাঝে প্রশ্নব্যাকুল। দ্বিধাসংকুল। প্রশ্নের উদ্দাম ঊর্মিমালায় মন কখনো কখনো সমস্যার সমুদ্রে দিশেহারা। হাল না ছেড়ে আবার পথে পথে পথের সন্ধানে। সাধ্যমতো পড়েছি, কিছু লেখালেখি করেছি। সাধু-গুরু-জ্ঞানী- বৈষ্ণব যখন যাকে নাগালের মধ্যে পেয়েছি, পাকড়াও করে জানতে চেয়েছি সুলুকসন্ধান। তত্ত্ব কথা। গূঢ় কথা।

গীতা কি শুধু ধর্ম কথা? হিন্দুর আকরগ্রন্থ? শুধু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কূট তর্ক? কূট প্রশ্ন? শুধু আত্মতত্ত্ব? পারত্রিক জীবনের ছাড়পত্র? সেথায় কোথাও কি জীবন নেই? কোথাও কি ফুটে ওঠেনি বাস্তব জীবনের জলছবি? প্রাত্যহিক যাপিত জীবনে এই গ্রন্থ কতখানি প্রাসঙ্গিক? দৈনন্দিন সূচিভেদ্য সমস্যার সমাধানে কতখানি সহায়ক? যদি শুধু ধর্মগ্রন্থ হয় ধার্মিক পড়বে। জানবে। বুঝবে। পণ্ডিতে বা বুদ্ধিতে নেবে। বোধে নেবে। আমজনতার কী আসে যায় তাতে। তার অন্ন চিন্তা চমৎকার। তার ম্লান-মূঢ় মূক মুখে যদি এ গ্রন্থ হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চিত্ত তল ঝলমল করাতে না পারে। যদি তার নিত্য দিনের সমস্যার সমাধান এ গ্রন্থ বিশল্যকরণী না হতে পারে—যদি তার ত্রি-তাপ দুঃখে এ গীতা দুঃখ হরনিয়া না হতে পারে তবে কেন সে এ গ্রন্থের প্রতি অনুভব করবে আকুতি, আকুল তৃষ্ণা, মরমের টান?

আমি বিদগ্ধ পণ্ডিত নই। জ্ঞানবান বোদ্ধা নই। একজন সামান্য অনুসন্ধিৎসু মানুষ মাত্র। জীবন প্রেমিক। জীবনের ভরাহাটে রস পেয়ালা ভরবার মানসে ঘাটে ঘাটে মাধুকরী করি।

গীতার অমল-কমল গীত বারে বারে রম্যবীন হয়ে বেজে ওঠে আশার মনের মুকুরে। সেই সুরের সুরলোকে পৌঁছাবার মানসে আমার এ দীর্ঘ মানসযাত্রা।

গীতা কি? পণ্ডিতেরা এককথায় উত্তর দিলেন—'য ভগবতা গীত সা গীতা'। অর্থাৎ ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীই গীতা। গীতার অবস্থান গীতাকার 'গীতার ধ্যান' অংশে ব্যাখ্যাটা আরও সুস্পষ্ট করে বললেন—

"ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িণীম্।
অমব ত্বামনুসন্দাধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।।"

গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলা। প্রাচীন ঋষি ব্যাসদেব তাঁর মহাকাব্য মহাভারতের মধ্যে আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গীতাকে মহাভারতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন। এই গীতা অদ্বৈত তত্ত্বের সার, অমৃত বর্ষিণী ও সংসারের কলুষনাশিনী ভগবতী। গীতাকার জননীস্বরূপা গীতাকে প্রণাম নিবেদন করছেন।

গীতার সঠিক রচনাকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তর্ক। যুক্তি। প্রতিযুক্তি। প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব মতের পিছনে একটা আপাতগ্রাহ্য যুক্তির জাল বিছিয়ে নিজস্ব মতে অনড় থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনো যুক্তির পিছনে পাথুরে প্রমাণ নেই। নেই কোনো সংশায়াতীত দলিল দস্তাবেজ। নেই ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা। অনেকটাই অনুমান নির্ভর। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, সমসাময়িক পুঁথি-পত্র, লোককথা ইত্যাদি তাঁদের পুঁজি। তবে মোটামুটি সকলে নিমরাজি হয়ে মেনে নিয়েছেন—গীতা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রন্থনা।

আড়াই থেকে তিন হাজার প্রায় পাঁচশ বছর একটা বিশাল বাফার স্টেটের মতো দীর্ঘ সময়কাল মাঝখানে রাখার ফলে বিশেষজ্ঞরা ভাবলেন—যাক্‌গে তাদের

পরাজয় ঘটেনি। আমরাও মেনে নিচ্ছি গীতা আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে গ্রন্থিত।

বিতর্কের পর বিতর্কের ধূম্রজাল। গীতার ঐতিহাসিক কাল নিরূপণ নিয়ে বিতর্কের পর এবার একদল সংশয়বাদী কূটতার্কিক প্রশ্নমুখর—গীতা প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত গীতা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাভারত লেখার পরে কোনো এক সময়ে সুকৌশলে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে।

তাঁদের তূণে নানা যুক্তিজাল। তাঁরা বলেন—যুযুধান দু-পক্ষ যখন যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্রভূমিতে হাজির তখন এই রকম জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা বা উপদেশের অবসর কোথায়? সময়ই বা কোথায়? দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে এই সব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন শত্রুপক্ষ অর্থাৎ কৌরব পক্ষীয় লোকজন কী করছিলেন? তৃতীয়ত, যুদ্ধের মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অর্জুনের মন কি এইসব গূঢ়তত্ত্ব কথা শোনবার মতো মানসিক অবস্থায় ছিল? চতুর্থত, শ্রীকৃষ্ণ তো বললেন, শুনলেন অর্জুন কিন্তু কীভাবে তার পরবর্তীতে নথিভুক্ত হলো? কে করলে? এবং আরও অনেক এবং অনেক বিরুদ্ধ মতের সমাহার।

গীতা প্রক্ষিপ্ত নয়। গীতা মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই মতাবলম্বীদের যুক্তিজাল আরও তীক্ষ্ণ। প্রত্যয়ী। বিশ্বাস উৎপাদক। তাঁরা গীতাকে মহাভারতের কালে রেখে বললেন—কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে হয় তার সময়কালকে সামনে রেখে। তাঁরা যুক্তি দিলেন—জয়দ্রথ বধের সময় যদি শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা পৃথিবীর থেকে ন'লক্ষ গুণ বৃহৎ সূর্যকে ঢেকে দিতে পারেন এবং আমরা সেটা তর্কাতীত ভাবে মেনে নিতে পারি তাহলে শ্রীকৃষ্ণ দু-পক্ষের সৈন্যকে সেই সময়কালের জন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন এটা মেনে নিতে অসম্মত হব কেন। যদি যুদ্ধের মাঝখানে শত্রুপক্ষীয় পঞ্চপাণ্ডব কুরু শিবিরে গিয়ে কৌরব জননী গান্ধারীর কাছে আশীর্বাদ চাইতে যেতে পারেন, যদি পাণ্ডবমাতা কুন্তি যুদ্ধের মাঝখানে কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে পক্ষত্যাগের আহ্বান জানাতে পারেন তাহলে এ ঘটনা অসম্ভব হবে কেন। তাঁরা আরও বলেন, তখন যুদ্ধ নীতি ছিল শঙ্খধ্বনি করে যতক্ষণ না যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করার রীতি ছিল না। তাই এই

সময়কাল দু-পক্ষই অপেক্ষা করছিল কখন এই কথোপকথন শেষ হয়ে যুদ্ধের শঙ্খ বাজবে। তাঁরা আরও যুক্তি দিলেন, যদি সঞ্জয় দিব্যচক্ষু দিয়ে ঘরে বসে সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাতে পারেন, তাহলে অর্জুন কেন দিব্যশক্তির প্রভাবে অসাধারণক্ষম হবেন না। বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের আগে অর্জুনকে তো দিব্যচক্ষু দিলেন—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুসা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম।।"

তুমি নিজের চোখ দিয়ে আমার এই অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখতে পারবে না। সহ্য করতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্যচোখ দিচ্ছি। তাহলে কৃষ্ণ যে আগে অর্জুনকে দিব্যশক্তি দেননি সে কথাই বা কে বলবে। তাঁরা যুক্তির একাঘ্নি বাণ ছাড়লেন এই বলে যে, মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব ও শান্তি পর্বে এবং আরও নানা জায়গায় গীতার কথা উল্লেখ আছে। যদি গীতা প্রক্ষিপ্ত হবে তাহলে মূল মহাভারতের নানা অংশে তার উল্লেখ থাকে কিভাবে?

বস্তুতপক্ষে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ষোড়শ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে অর্জুন গীতার উপদেশ বিস্মৃত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন পুনরায় সেই অমৃততত্ত্ব বলতে। তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"নশক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।"

হে অর্জুন, যোগযুক্ত হয়ে পূর্বে তোমাকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বলেছিলাম এখন আর আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? কারণ এখন আমি যোগযুক্ত নই। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে যখন তখন যোগযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া গীতার ভাষার সঙ্গে মহাভারতের ভাষার সাযুজ্যতা আছে।

পরিশেষে তাঁরা মোক্ষম যুক্তি দিলেন। ব্যাসদেব মহাকবি। কোনো কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কিছুকে কিছুতেই মেনে নেবেন না। কবিরা আত্মঅভিমানী। গীতা প্রক্ষিপ্ত হলে ব্যাসদেব কিছুতেই মেনে নিতেন না এই প্রক্ষেপণ। ব্যাসদেবের

পরেও যদি প্রক্ষিপ্ত হতো ব্যাসদেব অনুরাগীরা কেউ না কেউ আপত্তি অবশ্যই করতেন।

বিতর্কের যেন শেষ নেই। এক বিতর্ক কিছুটা স্থিমিত হলে আবার নতুন বিতর্ক। গীতার শ্লোকসংখ্যা কত? সংখ্যা নিয়ে নানান মত থাকলেও মোটামুটি দুটি মতই প্রধান। একদল বলেন গীতার শ্লোকসংখ্যা সাতশত পঁয়তাল্লিশ। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের সপ্তম শ্লোককে উল্লেখ করেন—

"—ষট্ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহু কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টি চ সঞ্জয়ঃ।।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতয়াঃ মানমুচ্যতে।।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছয়শত কুড়িটি, অর্জুনের সাতান্নটি, সঞ্জয়ের সাতষট্টিটি ও ধৃতরাষ্ট্রের একটি। এই মতের প্রবক্তা অনেক পন্ডিত, বোদ্ধা ও বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন। এদেশে এবং বিশ্বদেশেও। এ নিয়ে নানা পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ ও প্রচলিত মত ছিল তদানীন্তন কালে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগ্রহশালার অভাবে সেই সমস্ত প্রামাণ্য নথিপত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খর্ব করে হিন্দু ধর্মের নব জাগরণে শংকরাচার্যের অবদান অপরিসীম। শংকরাচার্যের সময় থেকে গীতাতে সাতশত শ্লোক বলে মানা হয়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পাঁচশত পঁচাত্তরটি, অর্জুনের চুরাশি, সঞ্জয়ের চল্লিশ ও ধৃতরাষ্ট্রের একটি। যেহেতু শঙ্করাচার্য নিজেও গীতার শ্লোকসংখ্যা সাতশত বলে মান্যতা দিয়েছেন—পরবর্তীকালে কেউ আর তা নিয়ে আপত্তি করেননি। ফলে বর্তমানে গীতা সাতশত শ্লোক সমন্বিত আকরগ্রন্থ বলে মান্যতা পেয়েছে।

গীতার উদ্ভবকাল, গীতার শ্লোকসংখ্যা নিয়ে মনীষীতে মনীষীতে বিস্তর বিবাদ, মতান্তর। কোথাও কোথাও বা মনান্তর। কিন্তু গীতার গুণমত্তার বিষয় নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

যুগে যুগে, কালে কালে, দেশে দেশে গীতার গুণমুগ্ধ ভক্ত ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সেখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-জৈন—কোনো ধর্মের কাঁটাতার বেড়া হয়ে দাঁড়ায়নি। সেখানে আস্তিক, নাস্তিক কোনো বাধা হয়ে

দাঁড়ায়নি। সেখানে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শাক্ত-শৈব-গাণপত্য-ব্রাহ্ম কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ধার্মিক আকৃষ্ট হয়েছেন তার ধর্মের মর্মকথায়। সমাজবেত্তা মগ্ন হয়ে কান পেতেছেন গীতার সমাজমনস্কতা ও গভীর সমাজলব্ধ জ্ঞান বাণীতে। ঐতিহাসিক লগ্ন হয়ে গীতার কালক্ষেম ক্ষমতা। গীতার চিরন্তন বাণী। শাশ্বত শক্তি। গীতার বাণী সেকাল পেরিয়ে একাল পেরিয়ে চিরকালের। চির মানবের এক মূর্ত বাণী রূপে অনুরণিত মানুষের মনের গোপন গুহাঘরে। কবি গীতাকে উপভোগ করছেন মূলত অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত এর কাব্য সুষমায়।

গীতা মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ গীতা সম্বন্ধে কি বলেছেন—

"গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ
অর্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সাহনির্বাচ্যপদাত্মিকা।"

তিনি বলেন—

গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরাবিদ্যা। অর্ধমাত্রা, অক্ষরা, নিত্যা ও অর্নির্বাচ্য পদাত্মিকা। ইহাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি সন্দেহ নেই বললেই আমরা তা মানব কেন। ভক্তের কাছে ভগবান মান্য। অভক্তের কাছে তিনি তো সেই মান্যতা দাবি করতে পারেন না। তাঁকে, তাঁর কথাকে মান্যতা দেবে তাঁর সাধক, পূজক। তাঁর কথাকে মান্যতা দেবে তাঁর পূজক, আরাধক। অন্যের তো সে দায় নেই। সেই দাবি তিনি করতে পারেন না। যাঁরা অহিন্দু, যাঁরা নাস্তিক, যাঁরা মূর্তিপূজার বিরোধী, তাঁদের সে দায় নেই। যাঁরা মূর্তিপূজার বিরোধী তাঁদের সে দায় থাকবে কেন।

এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ভিন্নতর ভিন্নতর দৃষ্টি অভিমুখ থেকে খোঁজ করতে হয় কোথায় সুপ্ত আছে গীতার প্রামাণ্যতা? প্রাধান্যত? শ্রেষ্ঠত? অমৃত স্বাদ? কোনো সুধা স্বাদে—

—"লোকে সজ্জন ষটপদ রহরহঃ পেপীয়মানং মুদা।"

সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ এই পদ্মের মধু আনন্দে অহরহ পান করছে।

খোঁজ করতে হবে সেই সুধা ভাণ্ডের। সেই অমৃত তত্ত্বের। সেই নির্ঝরিণী আনন্দ উৎসের এবং খোঁজ করতে হবে সেই সব ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন মতাবলম্বী

বিদগ্ধজনদের মতকে। মতবাদকে। মন্তব্যকে। সঙ্গে অবশ্যই থাকবেন তাঁরা যাঁরা গীতাকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মান্যতা দেন।

—নদীর কূল নাই, কিনারা নাইরে। পদ্মা নদীর বিশালতা বিস্তীর্ণতা অকূলতা দেখে কোনো এক কবির বিজন বুকে বেজে উঠেছিল ভাটিয়ালী গানের সুর। মন মজানো আবেশ। আবেগে। আনন্দে।

গীতার ব্যাখ্যাকর্তাদের, টীকাকারদের, মন্তব্যকারীদের খোঁজ করতে গিয়ে আমার মনের মাঝে তেমনি বিস্মিত প্রশ্ন, আনন্দ শীৎকার—

'কূল নাই কিনারা নাইরে'—

স্থান সংক্ষেপ। পাঠক অতি বিস্তারে বিব্রত। এই বাক্য শিরোধার্য করে এগুতে চাই। কিছু মানুষের মন্তব্য-মতবাদকে তুলে ধরতে চাই যাঁদের কথা না বললে প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

বলা হয়ে থাকে আচার্য শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই গীতার আদিমতম ও প্রাচীনতম ভাষ্য। অনেকে বলে থাকেন যে, শঙ্করাচার্যের আগে আচার্য বোধায়ন গীতার ওপর একটি বৃত্তি রচনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু সে পুঁথির পরবর্তীকালে কোনো হদিস মেলেনি সেক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যকে আদি ব্যাখ্যাকর্তা মেনে নিতে যৌক্তিক ও নৈতিক কোনো বাধা দেখছেন না পণ্ডিতমহল।

এরপর অজস্র ভারতীয় মনীষীর মনন ও প্রজ্ঞার আলোকে গীতা ব্যাখ্যাত ও পঠিত। এঁদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতমরা হলেন—রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, জ্ঞানেশ্বর, শ্রীধরস্বামী, নিম্বার্ক, নীলকণ্ঠ, মধুসূদনসরস্বতী, শঙ্করানন্দ, বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মনন্দ গিরি, কেশবভট্ট, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ, মুকুন্দদাস, রামনারায়ণ, শ্রীঅরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী.... আরও অনেক এবং অনেক।

কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধি স্থানে থেকেছেন অথচ গীতা গ্রন্থ নিয়ে কিছু বলেননি বা মন্তব্য করেননি এমন মনীষী প্রায় নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।

শুধু হিন্দু ধর্মে নয়, শুধু সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী বিদগ্ধজনেরা নন, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী বহু প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্টজনেরা গীতার গুণগান গেয়েছেন। চর্চা করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন নিজের নিজের মননে। মেধায়। মুনশিয়ানায়।

তাঁদের সকলের বক্তব্য হয়তো এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা যাবে না। তবু অন্তত বিশেষ কয়েকজনের নাম না উল্লেখ করলে দোষাবহ হবে।

ইরানীয় পর্যটক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত অলবেরুণী গীতার প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ এবং মন্তব্য করেছেন—'গীতা মানব জীবনের এক চিরন্তন সম্পদ। যতদিন মানব জীবন থাকবে, সমস্যা থাকবে গীতাশাস্ত্র ততদিন মানুষের সেবা ও শুশ্রূষায় থাকবে।'

মহামতি মোগল সম্রাট আকবরের মহামন্ত্রী আবুল ফজল ও তাঁর ভাই ফৈজী গীতার দুটি ফারসি অনুবাদ করেন। শাহ আলি দাস্তগীর নামে এক মুসলমান পণ্ডিত গীতার কাব্য সুষমায় মুগ্ধ হয়ে গীতার একটি ফারসি অনুবাদ করেন ও মানব জীবনে গীতার কী অপরিসীম প্রভাব তা নিয়ে নানা স্থানে নিজের উপলব্ধজাত ব্যাখ্যাও দেন। বিভিন্ন দেশের প্রায় প্রধান ছত্রিশটি ভাষায় গীতা অনূদিত, পঠিত ও আলোচিত হয়। তার মধ্যে আরবিও আছে। যা রচিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে মোঘল সম্রাটদের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়।

যাঁরা মুসলমানদের গোঁড়া ও অন্য ধর্মবিদ্বেষী বলে উষ্মা প্রকাশ করেন তাঁরা তাদের মত অন্তত আংশিকভাবে বদল করতে বাধ্য হবেন যদি মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর গীতা সম্বন্ধে মন্তব্যটি অনুধাবন করেন। বিদ্বেষ দিয়ে নয়, ধর্মীয় আস্থা দিয়ে নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা দিয়ে।

দারাশিকো সোৎসাহে বললেন—

"গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস, সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতায় পরমপুরুষের কথা বিবৃত, ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর ও শ্রেষ্ঠ রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে ....."

কোথাও কালিমা নেই। কলুষতা নেই। বিদ্বেষ নেই। ধর্মের বেড়াজাল দিয়ে বেড়ি পরানো নেই। আছে প্রেম, ভালোবাসা। আছে বিমুগ্ধতা।